জগদীশচন্দ্র বসু

(জন্ম : ১৮৫৮ মৃত্যু : ১৯৩৭)

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার বাড়িখাল গ্রামে জন্ম হয়েছিলো জগদীশচন্দ্রের। তার পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্বদেশপ্রেম ও শিল্পানুরাগ ছিলো তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই দুটি গুণ লাভ করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র। মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সরলতা ও উদার প্রকৃতি। অতিবাল্য বয়সেই মায়ের মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনে ভারতের সংস্কৃতির সনাতন ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সরকারি উচ্চপদে আসীন হলেও ভগবানচন্দ্র তৎকালীন সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী তথাকথিত শিক্ষিত ও বিত্তবানদের মতো উন্মার্গগামী ছিলেন না। জনসমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনোই বিচ্ছিন্ন বা শিথিল হয়ে যায়নি। শিক্ষাদানের জন্য তিনি পুত্রকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে গ্রামের সাধারণ মানুষের সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে বালক জগদীশচন্দ্র তাদের ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা-অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পর্যায়ের বিস্তৃতি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে তার গবেষণার বিষয় ছিলো পদার্থবিদ্যার-চুম্বকীয় তরঙ্গ। জার্মানীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরিখ হার্ৎজ আলোর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে রামধনুর সাতটি রঙের রহস্যে আটকা পড়েন। আমাদের দৃষ্টির নাগালে ধরা পড়ে যে সব রঙ তা হলো বেগুনি, নীল, আকশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। কিন্তু অতিবেগুনি ও অবলোহিত দুটি রঙ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। অতিবেগুনি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম এবং অবলোহিতের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশি - এই কারণে এই দুটি রঙ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে এসে এবারে আর পদার্থবিদ্যা নয় জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় হলো প্রাণিবিদ্যা। ভারতের সনাতন ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিলো সৃষ্টির মধ্যে জড় ও চেতন এই যে দুই সমান্তরাল ধারা প্রবাহিত এর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র নেই? সৃষ্টির সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে চতনার মহাসমুদ্র প্রবাহমান-জড় বা অবচেতন বলে সেখানে কিছু নেই-এই হল সনাতন ভারতের মনীষার চিরন্তন ঘোষণা।

ইউরোপের জড়বাদী বিজ্ঞানীরা এই সত্য স্বীকার না করলেও জগদীশচন্দ্র এই ঘোষণার সত্যতা নিরূপণে যত্নবান হলেন। তার পরীক্ষার স্থান হলো ঘন জঙ্গল। অনতিকালের মধ্যেই তিনি তার উদ্ভাবিত তড়িৎ তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র বা কোহিয়ারারের সাহায্যে দেখিয়ে নিলেন ক্রমাগত ব্যবহারের পর ধাতুর ক্লান্তি বা মেটালিক ফাটিগ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। সামান্য বিশ্রামের পরেই এই ধাতব ক্লান্তি মুছে যায়। টানা দুই বছরে গভীর গবেষণার পর লন্ডনের রয়েল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র কোহিয়ারারের মাধ্যমে জড়ের শরীরে চেতনার আভাস তুলে ধরলেন। এই গবেষণা সংক্রান্ত তার গবেষণাপত্রটির নাম রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং বা জীবন ও জড়ের সাড়া। জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার বিশ্ববিজ্ঞানের অঙ্গনে আলোড়ন তুললো। ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্ববিজ্ঞানীর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেন।

পরবর্তীকালে নিজের তৈরি নানা যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র বিশ্ববিজ্ঞান ক্ষেত্রে তুলে ধরেন উদ্ভিদের প্রাণের সাড়ার প্রমাণ। এই সত্যও তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন লন্ডনে রয়েল সোসাইটির মঞ্চে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সামনে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্ভিদের নাড়ীর স্পন্দন ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র তৈরি করে নিয়েছিলেন একটি যন্ত্র। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতোই নির্দিষ্ট ছন্দে উদ্ভিদের স্পন্দন রেখা ফুটে উঠলো সেই যন্ত্রের পর্দায়।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ জগদীশচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক পরীক্ষাটি যে সকল বিজ্ঞানীই মেনে নিলেন তা কিন্তু নয়। অন্য অনেক বিজ্ঞানীর মতো জগদীশচন্দ্রকেও বিরোধিতার ঝড়ের সম্মুখীন হতে হলো। যেসব শরীরবিদ সজীব কোষে প্রাণ-রসায়নের ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, প্রধানত তারাই বিরোধিতা করলেন জগদীশচন্দ্রের। আবার এই শরীরবিদদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েল সোসাইটিতে। ফলে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ রেসপন্সইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং সোসাইটির সংগ্রহে প্রকাশের অনুমতি থেকে বঞ্চিত হলো। কিন্তু সেদিন উদ্ভিদবিদ্যায় জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যার সাধারণত সূত্রগুলি যেভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার দ্বারা জীব-পদার্থবিদ্যা বা বায়োফিজিক্সের গোড়াপত্তন সকলের অজ্ঞাতে সাধিত হয়েছিলো।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সাতান্ন বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজে ত্রিশ বছর অধ্যাপনার পর জগদীশচন্দ্র এমেরিটাস প্রফেসর (অবৈতনিক প্রধান অধ্যাপক) হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। প্রায় একই সময়ে রসায়ন বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র চলে এলেন এখানে। তিনিই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক ও পরিচালক। এখানেই তার তত্ত্বাবধানে শুরু হলো নতুন ধারার গবেষণা। তার প্রতিভার দীপ্তি বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়তেও বিলম্ব হলো না।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্রকে ব্রিটিশ সরকার নাইট উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ রয়েল সোসাইটি তাকে ফেলো নির্বাচিত করে সম্মান জানান। তার যুগোত্তীর্ণ প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ভারতীয় মনীষীবৃন্দ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ নভেম্বর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

Jagadish Chandra Bose, www.banglainternet.com